সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে নারীজীবনের রূপায়ণ

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আফজালুল বাসার
Published online	March 1, 2025
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.6
Pages	৮৯-১০৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে নারীজীবনের রূপায়ণ

Check for updates

মালবিকা বিশ্বাস*

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাস এক যুগস্রষ্টা, অমর ইতিহাস রচয়িতা এবং সর্বোপরি ধ্রুপদী সাহিত্যের ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখনীতে স্থান পেয়েছে সমাজ, সংস্কার, পরিবেশ, প্রতিবেশ, চিরন্তন নর-নারীর প্রেমোপাখ্যানসহ মানবজীবনের মূত-বিমূর্ত সকল দিক। কালিদাস যে যুগের সূচনা করেছেন সে-যুগে তো বটেই, পরবর্তী যুগেও তিনি তুলনাহীন। তাঁর প্রতিভা, মন, মনন ও মেধা সর্বকালের প্রাচীর ডিঙিয়ে এক অনন্যসাধারণ রূপ ধারণ করেছে। কালিদাসের প্রশস্তি করেননি এমন সমসাময়িক বা পরবর্তী কালের প্রাজ্ঞব্যক্তি খুবই বিরল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে শুরু করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, এস.এন. দাসগুপ্ত প্রমুখ কীর্তিমান পুরুষ কালিদাসের প্রশস্তি গেয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের নবযুগের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত কালিদাস বন্দনায় কালিদাসকে 'পিককুল-পতি', 'অমৃত রসের স্রষ্টা', 'কবীন্দ্র' ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করে বলেন যে, তাঁর অবদান দেশ-বিদেশের সাহিত্যভুবনে চিরজাগরূক হয়ে থাকবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাষায় :

> কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
> কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?
> শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
> সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
> নব নাগরীর বেশে তুষিলেন বরে
> তোমায়; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
> আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে!–
> সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ, মহামতি?
> মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে,
> লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
> নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
> সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
> (পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
> দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে! (মধুসূদন, ১৩৬২ : ৬)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্মের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে মহাকবি কালিদাসভাবনা। তিনি গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কালিদাসের জন্ম, রচনাকাল এবং কাব্য-নাটকের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, কালিদাসের নাটক ও কাব্যে বেদ-

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপনিষদ, ইতিহাস, কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র, ধনুর্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের মর্মার্থ নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কালিদাস সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপলব্ধি:

> কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। সেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরি সাজানোতে আর বাছিয়া লওয়াতে। কোন্ কোন্ জিনিস্ বাছিয়া লইতে হইবে আর কেমন করিয়া বসাইলে সে সবগুলি ভালো করিয়া খুলিবে এই দুটি বুঝিতে তাঁহার মতো ওস্তাদ মিলিয়া উঠা ভার। তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন। প্রকৃতিতে যা-কিছু আছে সবই সুন্দর অথবা লিপিচাতুর্যে সব সুন্দর করিয়া তুলিব এ ভাব তাঁহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। তিনি স্বভাবশোভা কাহাকে বলে জানিতেন, চিনিতেন, এবং সেগুলি বাছিয়া লইতে ও সাজাইতে খুব মজবুদ ছিলেন। ... পৃথিবীতে বর্ণনীয় জিনিস দুই — অন্তর্জগৎ — মনুষ্যের মন; আর বাহ্যজগৎ। নির্মল আকাশ, সুদূরবিস্তৃত অরণ্যশ্রেণী, মেঘমালাবৎ প্রতীয়মান পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি। কালিদাসের বই পড়িলে বোধ হয় এই দুই-এর মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর সবই তাঁহার একচেটে। মনুষ্যজাতির মধ্যে সুন্দর রমণীগণ; রমণীহৃদয়ে পবিত্র প্রণয়, পরম সুন্দর। কালিদাস সেই প্রণয়ই নানাপ্রকারে দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হৃদয়ের অন্যান্য প্রবৃত্তির মধ্যে যেগুলিতে লোকের মন আকর্ষণ করে সেগুলি সব তাঁহার পুস্তকে আছে। (হরপ্রসাদ, ২০০৬ : ১৩৭-৩৮)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে কালিদাসকে সাহিত্যজগতের এক উচ্চাসনে স্থান দিয়ে বলেছেন, কালিদাসের কাব্যভাবনা চিরপ্রবহমান নদীর মতো মানুষের কাছে যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিরাজ করবে। তিনি তাঁর *চৈতালি* কাব্যে বলেছেন :

> আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
> কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
> কোথা সেই উজ্জয়িনী—কোথা গেল আজ
> প্রভু তব, কালিদাস, রাজ-অধিরাজ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪২)
>
> তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
> ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
> আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই
> দুঃখদৈন্যদুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
> জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
> অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৪৪)

ভারতের সারস্বত সাধনায় কালিদাসের অবদান ঋষি অরবিন্দের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি কালিদাসকে প্রাচীন ভারতের বাল্মীকি, বেদব্যাস প্রমুখের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে এক যুগপথিক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি তাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেও অভিহিত করেন। *কালিদাস* নামক একটি ইংরেজি পুস্তিকায় ঋষি অরবিন্দ কালিদাসের প্রশস্তি করে বলেন :

> Valmiki, Vyasa and Kalidas are the essence of the history of ancient India; if else were lost, they would still be its sole and sufficient cultural history.

> Their poems are types and exponents of three periods in the development of the human soul, types and exponents also of the three great powers which dispute and clash in the imperfect and half-formed temperament and harmonise in the formed and perfect. At the same time their works are pictures at once minute and grandiose of three moods of our Aryan civilisation, of which the first was predominatingly moral, the second predominatingly intellectual, the third predominatingly material. The fourth power of the soul, the spiritual, which can alone govern and harmonise the others by fusion with them, had not, though it pervaded and powerfully influenced is successive development, any separate age of predominance, did not like the others possess the whole race with a dominating obsession. It is because, conjoining in themselves the highest and most varied poetical gifts, they at the same time represent and mirror their age and humanity by their interpretative largeness and power that our three chief poets hold their supreme place and bear comparison with the greatest world-names, Homer, Shakespeare and Dante. (Aurobindo, 1929 : 1-2)

এস. এন. দাসগুপ্তের মতে, ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের অবদান অতুলনীয়, আকাশচুম্বী এবং চিরন্তন। তা ভারতীয় সাহিত্যে নবযুগের সূচনা করে। কালিদাস প্রশস্তিতে তিনি বলেছেন :

> In Kalidasa we are introduced at once to something new which no one hit upon before, something perfect which no one achieved, something incomparably great and enduring for all time. His outstanding individual genius certainly accounts for a great deal of this, but it appears in a sudden and towering glory, without being buttressed in its origin by the intelligible gradation of lower eminences. It is, however, the effect also of the tyrannical dominance of a great genius that it not only obscures but often wipes out by its vast and strong effulgence the lesser lights which surround it or herald its approach. (Surendranath (S.N.) 1947 : 118)

মহাকবি কালিদাস তিনটি নাটক ও চারটি কাব্য রচনা করে জগৎখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নাটক তিনটি হলো : (১) *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* (২) *বিক্রমোর্বশীয়ম্* (৩) *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*। কাব্য চারটির মধ্যে দুটি সর্গবদ্ধ মহাকাব্য : *রঘুবংশম্* ও *কুমারসম্ভবম্* এবং দুটি খণ্ড কাব্য : *মেঘদূতম্* ও *ঋতুসংহারম্*।[১] তিনটি নাটকেই প্রেমোপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া খণ্ডকাব্য দুটিও প্রেমমূলক। আর মহাকাব্য দুটোর একটি *কুমারসম্ভবম্* মানবাচারী দেবতার মহৎ প্রেমকাহিনী ও অপরটি *রঘুবংশম্* একটি মহৎ রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনী।

কালিদাসের সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের মধ্যে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* এক অমর সৃষ্টি। এটি তাঁর পরিণত প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এর অঙ্ক সংখ্যা সাত। মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমোপাখ্যানকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। নাটকের চরিত্র অঙ্কনে কালিদাস অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি মানবমনের অতল গহ্বরে প্রবেশ করে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার এক সার্থক চিত্র রূপায়ণ করেছেন।

ফলে তাঁর চরিত্রগুলো মূর্তিমান মানুষের জীবন্ত ছবি — যা স্বাভাবিক, সজীব এবং বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রেই এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা একান্তই তার নিজস্ব। তবে নারী-চরিত্রগুলো তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা আমাদের দেশে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ফলে এর প্রভাব দৃষ্ট হয় সর্বত্র। এমনকি কবি-নাট্যকারদের লেখনীতেও। ফলে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার প্রভাব কালিদাসের বিভিন্ন রচনায় বিশেষ করে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এও পরিলক্ষিত হয়। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে সব মিলিয়ে তেইশটি নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এদের মধ্যে নাটকে কারো ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারো ভূমিকা গৌণ। আবার কেউ কেউ পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে নাটকে উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। নিম্নে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ* বর্ণিত নারী চরিত্রগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো :

নটী – সূত্রধারের স্ত্রী
শকুন্তলা – নাটকের নায়িকা, স্বর্গের অপ্সরা মেনকা ও বিশ্বামিত্রের কন্যা, কণ্বের পালিতা কন্যা এবং দুষ্যন্তের কনিষ্ঠা পত্নী
অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা – শকুন্তলার প্রিয় ও নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী সখী
মেনকা – স্বর্গের অপ্সরা, শকুন্তলার জন্মদাত্রী, পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে নাটকে উল্লিখিত চরিত্র
গৌতমী – কণ্বমুনির আশ্রমের একজন বয়োজ্যেষ্ঠা তাপসী এবং শকুন্তলার মাতৃস্থানীয়া
পরভৃতিকা ও মধুকরিকা – রাজার উদ্যানপালিকা
চতুরিকা – রাজার পরিচারিকা
যবনী – রাজার শিকারকালীন পরিচারিকা
বেত্রবতী – প্রতিহারিণী, দ্বাররক্ষিণী
তরলিকা – রানি বসুমতীর পরিচারিকা
অদিতি – মারীচ মুনির পত্নী
সানুমতী – স্বর্গের অপ্সরা, মেনকার বান্ধবী
রাজমাতা – দুষ্যন্তের মাতা, সংলাপের মাধ্যমে নাটকে উল্লিখিত চরিত্র
হংসপদিকা – দুষ্যন্তের স্ত্রী, অবহেলিতা, সংলাপের মাধ্যমে নাটকে উল্লিখিত চরিত্র
বসুমতী – দুষ্যন্তের জ্যেষ্ঠা পত্নী, সংলাপের মাধ্যমে নাটকে উল্লিখিত চরিত্র
পৌলোমী – ইন্দ্রের পত্নী, সংলাপের মাধ্যমে নাটকে উল্লিখিত চরিত্র
সুব্রতা – মারীচের আশ্রমের তাপসী
তাপসী – মারীচের আশ্রমের তাপসী, সুব্রতার সখী
তাপসীগণ – কণ্বের আশ্রমের তিনজন তাপসী

উপর্যুক্ত নারীচরিত্রগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে সমাজে তাদের অবস্থান তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই ধরা যাক, নাটকের নায়িকা শকুন্তলার মা অপ্সরা মেনকার কথা। দুষ্যন্তের সাথে শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতেই দুষ্যন্ত শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার নিকট তার পরিচয় জানতে চান। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এক সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের গভীর তপস্যারত অবস্থায় অজ্ঞাত কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত দেবতারা তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করার

চেষ্টায় নিযুক্ত করলেন অপ্সরা মেনকাকে। বসন্তের আবির্ভাবে অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিতা মেনকা বিশ্বামিত্রের সম্মুখে উপস্থিত হলে মেনকার রূপ-লাবণ্যে ঋষির মনে কামনার উদ্রেক হয় এবং তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে — বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করার জন্য কেন একজন নারী অর্থাৎ অপ্সরা মেনকাকেই প্রয়োজন হলো? কোনো পুরুষ দ্বারা কি এ কাজ সিদ্ধ হতো না? নারীর প্রতি কামনার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোনোভাবেই কি ঋষির ধ্যান ভঙ্গ করা সম্ভব ছিল না? এ থেকে অনুমিত হয় যে, সমাজে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ, নারী অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হতো। নাটকের সংলাপ থেকে আরো জানা যায় যে, বিশ্বামিত্র ও মেনকার গর্ভজাত সন্তানই শকুন্তলা এবং জন্মের পরপরই শকুন্তলা পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্তা। সর্বজনস্বীকৃত সত্য হচ্ছে, সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব পিতা-মাতা উভয়েরই। তবে মেনকা অপ্সরা বিধায় তাঁর মর্ত্যে বসবাসের কথা নয়। কিন্তু বিশ্বামিত্রের অবস্থান তো মর্ত্যেই। তাই তিনি কি পারতেন না কন্যা শকুন্তলার দায়িত্ব পালন করতে? অবশ্য এক্ষেত্রে সান্ত্বনা এই যে, শকুন্তলা যাঁর কাছে পালিতা, তিনি একজন পুরুষই ছিলেন। মহর্ষি কণ্বের অকৃত্রিম অপত্য স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত শকুন্তলা যৌবনে পদার্পণ করে। শকুন্তলার এই যৌবন প্রাপ্তির পরপরই আমরা আবার পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অবমাননাকর পরিস্থিতি দেখতে পাই। প্রথম দর্শন থেকেই দুষ্যন্তের মুখে আমরা বারবার শকুন্তলা-সম্ভোগের কথাই শুনতে পাই। স্বয়ং দুষ্যন্তের উক্তি :

> অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
> কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥ ১/১৯ (কালিদাস, ২০১১ : ১৪৪)

অর্থাৎ, তার ঠোঁট নতুন পাতার মতো রক্তাভ, কোমল শাখার মতো যেন দুই বাহু, সারা শরীরে যেন ফুলের মতো লোভনীয় যৌবন ছড়িয়ে আছে।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম দর্শনেই দুষ্যন্তের মুখে 'লোভনীয়ং' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার যখন তিনি শকুন্তলার জন্মপরিচয় তথা বর্ণ নিয়ে সন্দিগ্ধ ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, তখনই নিজ কামনা পরিপূরণে তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছে :

> অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা,
> যদার্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
> সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
> প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥ ১/২০ (কালিদাস, ২০১১ : ১৪৫)

অর্থাৎ, এই কন্যার অবশ্যই কোনো ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে বাধা নেই; কেননা আমার কর্তব্যনিষ্ঠ মন এর প্রতি আকৃষ্ট। সন্দেহের ক্ষেত্রসমূহে সৎ লোকের মানসিক প্রবৃত্তিই প্রমাণ।

অতঃপর তিনি সখীদের নিকট শকুন্তলার পরিচয় সম্পর্কে অবগত হয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি :

> ভব হৃদয়! সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
> আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্ ॥ ১/২৫ (কালিদাস, ২০১১ : ১৪৮)

অর্থাৎ, হে হৃদয়, সমস্ত সন্দেহ দূর হওয়ায় এখন তুমি শকুন্তলাকে পাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করতে পার। যাকে তুমি আগুন বলে ভেবেছিলে, প্রকৃতপক্ষে তা স্পর্শ করা যায় এমন রত্ন।

এভাবে সময়ের অগ্রগতিতে আমরা দুষ্যন্তের মুখে শুধু শকুন্তলার গুণকীর্তন তথা রূপলাবণ্যের বর্ণনাই শ্রবণ করি। বিদূষকের নিকট বারবার তিনি শকুন্তলার রূপের বর্ণনা করেন। তিনি মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হন যে, শকুন্তলাও তাঁর প্রতি আসক্ত। তবে তাঁর সমস্ত ভাবনা, সমস্ত দ্বিধা, সবকিছুকে ছাপিয়ে শুধু শকুন্তলার সাথে দৈহিক মিলনের বাসনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর উক্তিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় :

> অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
> রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
> অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
> ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ। ২/১০ (কালিদাস, ২০১১ : ১৫৪)

অর্থাৎ, যে ফুলের ঘ্রাণ কেউ গ্রহণ করেনি এ যেন এমনই এক ফুল, যে পাতা কেউ আঙুল দিয়ে ছিঁড়ে নেয়নি, এ যেন এমনই এক নতুন পল্লব, যে মধুর আস্বাদ কেউ গ্রহণ করেনি, এ যেন এমনই এক নতুন মধু। নিষ্পাপ এমন রূপ যেন বহু পুণ্যের অখণ্ড ফল। জানি না, একে ভোগ করার জন্য বিধি কাকে পাঠাবেন।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলার সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপের বিবরণ উপস্থাপনের মধ্যে নারীর রূপ-মাধুর্য বর্ণনা অবশ্যই বিদ্যমান, তবে তিনি যে ঘটনা-পরম্পরায় শকুন্তলার রূপ-লাবণ্য পরিবেশন করেছেন, সেখানে নারীর রূপ-মাধুর্য নয়, বরং অত্যন্ত প্রকটভাবে ভোগ-লালসাকেন্দ্রিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, একজন অনাঘ্রাতা রমণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টিকেও রাজা একেবারেই বিবেচনায় আনেন নি। এখানে কি নারীর স্বাধীনতা উপেক্ষিত হয় নি? যে-কোনো যুক্তিতেই আমরা বলব এখানে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা-স্বাধীনতা উপেক্ষিত ও পদদলিত হয়েছে। আবার তাঁর এই মনোভাব যাতে অন্তঃপুরের নারীদের কাছে উন্মোচিত হয়ে না পড়ে, সেজন্য রাজপুরীতে ফেরার পূর্বে তিনি কৌশলে বিদূষককে বুঝিয়ে দেন যে, তিনি শকুন্তলার কথা যা বলেছেন তা সবই ছিল উপহাস :

> ক্ব বয়ং ক্ব পরোক্ষমন্মথো মৃগশাবৈঃ সমমেধিতো জনঃ।
> পরিহাসবিজল্পিতং সখে! পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥ ২/১৮ (কালিদাস, ২০১১ : ১৫৭)

অর্থাৎ, নগরসভ্যতায় বেড়ে ওঠা আমাদের মতো মানুষ এবং প্রকৃতির গাছ-পালা-পশু-পাখির সঙ্গে বেড়ে ওঠা একজন কামবিমুখ নারীর মধ্যে পার্থক্য অনেক। তাই শকুন্তলা সম্পর্কে যা বলেছি পরিহাস করেই বলেছি। আমার কথা সত্য ভেবো না।

কী নিষ্ঠুর প্রতারকের উক্তি!

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, এখানে রাজা দুষ্যন্ত দ্বৈত চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। একদিকে তাঁর মনের গহীনে কাম-পিপাসা চরিতার্থ করার স্বেচ্ছাচারী মনোভাব,

অন্যদিকে অন্তঃপুরের রাজমহিষীদের নিকট নিজ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা বজায় রাখার চেষ্টা। আবার এই রাজার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয় :

পরিগ্রহবহুত্বে2পি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥ ৩/১৮ (কালিদাস, ২০১১ : ১৬২)

অর্থাৎ, অনেক পত্নী থাকা সত্ত্বেও আমার বংশের মাত্র দুটি গৌরব – একটি সমুদ্র পরিবেষ্টিত পৃথিবী, অন্যটি হলো আপনাদের সখী। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে তাঁর চরিত্রের কপটতাই প্রকাশিত হয়। এমনকি শকুন্তলার সম্ভোগ কামনায় যে-কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। শকুন্তলার অসুস্থ অবস্থায় তার পদসেবা পর্যন্ত করতে চেয়েছেন। শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে[২] বিয়ে করতে প্ররোচিত করেছেন। তাঁর উক্তিতে পাই :

গান্ধর্বেণ বিবাহেন বহ্বো রাজর্ষিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৩/২১ (কালিদাস, ২০১১ : ১৬৩)

অর্থাৎ, বহু রাজর্ষির মেয়ে গান্ধর্বমতে বিয়ে করার পর তাদের পিতা-মাতাও সম্মতিজ্ঞাপন করেছেন — এ রকম শোনা যায়।

আবার দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে আকৃষ্ট করার জন্য একের পর এক প্রণয় উক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরই এক পর্যায়ে শকুন্তলা স্ব-আশ্রমে ফেরার বাসনা ব্যক্ত করে। উত্তরে দুষ্যন্ত বলেন :

অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি! গৃহ্যতে রসো2স্য ॥ ৩/২২ (কালিদাস, ২০১১ : ১৬৩)

অর্থাৎ, হে সুন্দরি! ভ্রমর কর্তৃক নবপুষ্পের মধু আহরণের মতো পিপাসার্ত আমি তোমার ক্ষতহীন কোমল অধরের আস্বাদ নেওয়ার পর তবে তোমাকে ছাড়ব।

দুষ্যন্তের এসব উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দুষ্যন্তের যেন সর্বদাই শকুন্তলাকে ভোগ করার প্রতিই বেশি মনোযোগ ছিল। শকুন্তলাও ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতি আসক্তি অনুভব করে। অতঃপর গান্ধর্বমতে তাঁদের বিয়ে হয় এবং দৈহিক মিলন ঘটে। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে তাঁর হস্ত-অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানরূপে প্রদান করেন এবং অতি শীঘ্র তাকে রাজপুরীতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে বিয়ে করার পরও কেন সঙ্গে নিলেন না? শকুন্তলার প্রতি পবিত্র ভালোবাসার আকর্ষণ অনুভব করে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর তাহলে শকুন্তলা পতিচিন্তায় মহর্ষি দুর্বাসাকে উপেক্ষাও করত না এবং দুর্বাসা কর্তৃক অভিশাপের ধূম্রজালে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাও সহ্য করতে হতো না তাকে। তবে অনেকে দুষ্যন্তের পক্ষে মত প্রদর্শন করে বলতে পারেন যে, পিতা কণ্বমুনি আশ্রমে ছিলেন না বিধায় পিতার অনুপস্থিতিতে তিনি শকুন্তলাকে সঙ্গে নিতে চাননি। কিন্তু পিতার অবর্তমানে গান্ধর্বমতে কন্যার বিয়ে সংঘটিত হতে পারলে কেন কন্যা-বিদায় হতে পারবে না? তদুপরি করভকের মাধ্যমে যখন দুষ্যন্ত

অবহিত হলেন যে, মাতা কর্তৃক পালনীয় 'পুত্রপি-পালন' নামক উপবাসের দিন মা পুত্রকে রাজধানীতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখন তো তিনি তপোবনকে রাক্ষসমুক্ত করার অজুহাতে সেখানেই থেকে গেলেন এবং বিদূষককে মায়ের কাছে পাঠালেন। এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি স্বয়ং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে সৈন্যবাহিনীকে রেখে যেতে পারতেন তপোবন রক্ষার দায়িত্বে। অথচ তিনি তা করেন নি। আর এর কারণও স্পষ্ট; তা হলো, শকুন্তলার সঙ্গে মিলন। সুতরাং, শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তিনি যদি এতদিন তপোবনে অবস্থান করতে পারলেন, তাহলে কণ্বমুনি ফিরে আসা পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করতে পারলেন না? এ হেন কার্য থেকে শকুন্তলার প্রতি তাঁর কামোন্মাদনার মনোভাবই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

শকুন্তলাকে রেখে দুষ্যন্তের রাজধানীতে গমনের পর পিতা মহর্ষি কণ্ব তপোবনে ফিরে শকুন্তলার বিয়ে সম্পর্কিত সমুদয় বিষয় অবগত হলেন। তিনি তাঁদের বিয়ে অনুমোদন করলেন এবং শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠানোর সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। বিদায়ের সময় পিতা কণ্বের উপদেশবাণীতেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিচ্ছবি ধ্বনিত হয় :

> শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু পিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
> ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
> ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
> যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥ ৪/১৮ (কালিদাস, ২০১১ : ১৭৩)

অর্থাৎ, তুমি এখান থেকে স্বামীর গৃহে গিয়ে গুরুজনদের পরিচর্যা করবে, সপত্নীদের সঙ্গে সখীর মতো ব্যবহার করবে। স্বামী বিরুদ্ধাচরণ করলেও তুমি রাগান্বিত হয়ে অনুরূপ আচরণ করবে না। দাসদাসীদের প্রতি দয়াপোষণ করবে। কখনো গর্ব করবে না। মেয়েরা এভাবেই সুগৃহিণী হয়। যারা এরূপ আচরণ না করে তারা বংশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এই উক্তির মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দুর্দমনীয় মনোভাব অত্যন্ত সুন্দর ও সুললিত ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। পিতা কণ্ব স্বামীর প্রতিকূল আচরণের পরিপ্রেক্ষিতেও বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছেন। এমন কেন হবে? স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই স্বমত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবুও আমরা কণ্বের ক্ষেত্রে এটা মেনে নিতে পারি এজন্য যে, পিতা হিসেবে তিনি কন্যাকে উপদেশ দিয়েছেন।

নাটকের অগ্রগতিতে আমরা আরো লক্ষ করি, যে শকুন্তলাকে পাওয়ার জন্য দুষ্যন্তের তপোবনে অবস্থানের এত চেষ্টা, এত প্রয়াস, সেই শকুন্তলাকে রাজসভায় তিনি চিনতেও পারলেন না। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা যায় যে, নাট্যকার নিজেই একজন পুরুষ এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি পুরুষ-আধিপত্যের কথাই বিবেচনা করবেন। ফলে আমরা লক্ষ করি, নাট্যকার তাঁর নাটকে নায়ক দুষ্যন্তকে রক্ষা করার জন্য সর্বতো প্রয়াস চালিয়েছেন। এ কারণেই তিনি দুর্বাসার অভিশাপের অবতারণা করেছেন। কিন্তু পূর্ণসভাষদ পরিবেষ্টিত রাজসভায় স্বামী প্রত্যাখ্যাতা একজন নারীর মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, তার আত্মসম্মানে কতটা আঘাত লাগতে পারে — নাট্যকার একবারও সে বিষয়টি বিবেচনা করেননি। উল্টো দুষ্যন্তের কণ্ঠেই পুরুষশাসিত সমাজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে :

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমঞ্চ পাতয়িতুম্।
কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমোঘং তটতরুঞ্চ ॥ ৫/২১ (কালিদাস, ২০১১ : ১৮০)

অর্থাৎ, কূল ভাঙা নদী যেরূপ নদীর স্বচ্ছ জলরাশিকে অস্বচ্ছ করে এবং নদী তীরবর্তী বৃক্ষকে উপড়ে ফেলে, তুমিও তদ্রূপ নিজ বংশকে কলুষিত করে আমাকে কলঙ্কিত করতে ব্রতী হয়েছ?

এছাড়াও দুষ্যন্ত বলেন :

এবমাদিভিরাত্মকার্যনির্বর্তিনীনাং মধুরাভিরমৃতবাগ্ভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ।
(কালিদাস, ২০১১ : ১৮১)

অর্থাৎ, মেয়েরা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্ত এ রকম বহু মিথ্যা অথচ শ্রুতিমধুর কথা বলে বিষয়-সম্পদের প্রতি আসক্ত মানুষকে আকৃষ্ট করে।

দুষ্যন্ত আরো বলেন :

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু
সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরীক্ষগমনাৎ স্বমপত্যজাতম্
অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ কিল পোষয়ন্তি ॥ ৫/২২ (কালিদাস, ২০১১ : ১৮১)

অর্থাৎ, মানবেতর স্ত্রীজাতির মধ্যেও প্রকৃতিপ্রদত্ত পটুত্ব বর্তমান থাকে, আর বুদ্ধিবৃত্তি গুণসম্পন্ন স্ত্রীলোকদের তো থাকবেই। কোকিল উড়তে শেখার পূর্বেই নিজ বাচ্চাদের অন্য পাখিদের মাধ্যমে পালন করায়।

দুষ্যন্তের মুখে শকুন্তলার উদ্দেশে একটার পর একটা এ হেন কটূক্তির পর শকুন্তলাকে বলতে দেখা যায় কেবল 'অনার্য' বলে দুষ্যন্তকে ধিক্কার দিতে। কিন্তু স্বীয় সম্মান, অভিমান বাঁচাতে নাট্যকার কি শকুন্তলার মুখে আরো একটু কঠোর ভাষা দিতে পারতেন না? নাকি তিনি চিন্তা করেছেন যে, এতে রাজা দুষ্যন্তের সম্মানে আঘাত লাগবে এবং সেটা হবে খুবই অপ্রীতিকর ও পুরুষ সমাজবিরোধী? আবার ঋষি শার্ঙ্গরব যিনি শকুন্তলাকে চোখের সামনে বেড়ে উঠতে দেখেছেন, তিনিও প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার প্রতিই রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করে তাকে ত্যাগ করে চলে যান। শার্ঙ্গরব বলেন :

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা
ত্বমসি কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচি ব্রতমাত্মনঃ
পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্ ॥ ৫/২৭ (কালিদাস, ২০১১ : ১৮২)

অর্থাৎ, মহারাজ যা বলছেন আসলেই যদি তুমি তাই হও, তবে বংশের মুখে কলঙ্ক প্রদানকারিণী তোমাকে পিতা কিভাবে গ্রহণ করবেন? যদি ব্রতকে পুতপবিত্র বলে মনে করো তাহলে স্বামীর গৃহে দাসীবৃত্তিও তোমার জন্য ভালো।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি নারী চরিত্রের কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন কণ্বমুনির আশ্রমের একজন বয়োজ্যেষ্ঠা তাপসী এবং শকুন্তলার মাতৃস্থানীয়া যাঁর নাম গৌতমী। আশ্রমের সকলের জন্য তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় পাই। এই গৌতমী শকুন্তলার অসুস্থতার সংবাদে উদ্বিগ্ন হন, শকুন্তলার পতিগৃহে গমনকালে শোকাভিভূত হয়ে পড়েন, শকুন্তলাকে চিনতে না পারার সময় অবগুণ্ঠন উন্মোচনের দ্বারা রাজা দুষ্যন্তের বিশ্বাস সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, শকুন্তলার জন্য রাজ-কটূক্তি উপেক্ষা করেন এবং অসহায় শকুন্তলার ক্রন্দনে অস্থিরতা প্রকাশ করেন। এই মাতৃস্নেহময়ী গৌতমীকে শকুন্তলার জীবনের চরম সিদ্ধান্তের সময় এক ভিন্নরূপে নাট্যকার আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। গৌতমীর চরিত্রে মাতৃত্বের যে চিরায়ত রূপ ইতঃপূর্বে আমরা লক্ষ করেছি হঠাৎ করেই যেন নাট্যকার এর ব্যতিক্রম ঘটান: পুত্রতুল্য জামাতা দুষ্যন্তকে শ্বশ্রূমাতা হিসেবে গৌতমীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার কথা। কিন্তু মাতৃস্নেহপরায়ণা গৌতমীর মুখ থেকে নাট্যকার উচ্চারণ করালেন :

> আর্য, কিমপি বক্তূকামাস্মি। ন মে বচনাবসরো2স্তি। কথমিতি। (কালিদাস, ২০১১ : ১৭৮)

> নাপেক্ষিতো গুরুজনঃ, অনয়া ন ত্বয়াপি পৃষ্টো বন্ধুঃ।
> একৈকস্য চ চরিতে ভণতু কিমেক একস্মিন্।। ৫/১৬ (কালিদাস, ২০১১ : ১৭৯)

অর্থাৎ, আর্য, আমি এখানে কিছু বলতে চাই না। তাছাড়া আমার বলার তেমন কোনো অবকাশও নেই। কারণ আপনারা গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ না করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তাই পতিগৃহে নেয়া না নেয়ার সিদ্ধান্ত আপনাদেরই।

এখানে উল্লেখ্য, যে গৌতমী মাতৃস্নেহ দিয়ে শকুন্তলাকে লালন-পালন করেছেন, সেই গৌতমীকে নাট্যকার অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলার জীবনের চরম পরীক্ষালগ্নে মাতা হিসেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দায় থেকে বিরত রাখলেন। এখানে কি তাঁর মাতৃত্বের অধিকার খর্ব হলো না?

আবার দেখা যায়, রাজপুরোহিত পরামর্শ দিলেন যে, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত শকুন্তলাকে তাঁর কাছে রাখতে। কারণ ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, দুষ্যন্ত প্রথমেই রাজ চক্রবর্তী লক্ষণযুক্ত পুত্রের পিতা হবেন। এখন প্রশ্ন হলো, যে কর্ম দুষ্যন্ত-শকুন্তলা দুজনেই করলেন তার জন্য সকলেই কেন শুধু শকুন্তলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন? পরীক্ষা কেন শুধু শকুন্তলাকেই দিতে হবে? কারো মনে কি দুষ্যন্তের জন্য কোনো সন্দেহ থাকা উচিত ছিল না? আর এসব ঘটনা শেষে ষষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায়, প্রকৃত ঘটনা জানার পর দুষ্যন্ত শকুন্তলার শোকে মুহ্যমান। তাঁর এই অবস্থাকে আমরা কিভাবে বিচার করব? তিনি কি প্রকৃতই শকুন্তলার প্রতি ভালোবাসা থেকেই শোক করছিলেন? নাকি নিজের কর্ম স্মরণ করার পর স্বীয় ধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে অনুতাপ করছিলেন? কেননা তিনি উপবনে বসে শকুন্তলার চিত্র দেখার সময় রানি বসুমতীর আগমনের সংবাদ পেয়ে ভয়ে চিত্রটি লুকিয়ে ফেলেন। প্রকৃত তথা বিশুদ্ধ ভালোবাসা থাকলে তিনি কখনো ভয় পেতেন না। আর অন্যের প্রতি আসক্তির কথা জানলে রানি রুষ্ট হবেন—একথাও চিন্তা করতেন না। যেমন রুষ্ট হতে দেখি রানি হংসপদিকাকে পঞ্চম অঙ্কের শুরুতে নেপথ্যে তার সঙ্গীতের মাধ্যমে :

অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্‌।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর! বিস্মৃতোহস্যেনাং কথম্‌ ॥ ৫/১ (কালিদাস, ২০১১ : ১৭৫)

অর্থাৎ, মৌমাছি যেমন নতুন নতুন ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনি দুষ্যন্তও মৌমাছির মতো নতুন নতুন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সম্ভোগে রত হন এবং অচিরেই তাকে ভুলে যান।

এই সঙ্গীতের আক্ষরিক অর্থ এরকম হলেও এর ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য ভিন্নরূপ। একদা রাজা দুষ্যন্তের 'প্রিয়পাত্রী', 'সহকারমঞ্জুরী', 'প্রেমাস্পদী' হংসপদিকা উক্ত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তার অবহেলিত, বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত নারীজীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। রাজার স্বেচ্ছাচারিতা ও রিপুপরবশতার কারণে একজন নারীর কি করুণ পরিণতি হতে পারে তারই মূর্ত উদাহরণ এই হংসপদিকা। নাট্যকার কালিদাস পুরুষশাসিত সমাজের একজন প্রতিনিধি। তাঁর অবচেতন মনে নারী সম্পর্কে এরূপ ধারণা থাকার কারণেই তিনি তাঁর নাটকে হংসপদিকার মতো একজন অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী চরিত্রের অবতারণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই মন্তব্য করেছেন : "কবি [কালিদাস] নিপুণ কৌশলে জানাইয়াছেন, দুর্বাসার শাপে যাহা ঘটাইয়াছে স্বভাবের [রাজস্বভাবের] মধ্যে তাহার বীজ ছিল। কাব্যের খাতিরে যাহাকে আকস্মিক করিয়া দেখানো হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক [রাজ-চারিত্রিক]।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৭২৯)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও নারীদের প্রতি কালিদাসের এরূপ চরিত্রচিত্রণে আক্ষেপ করে বলেছেন দুর্বাসার অভিশাপ দ্বারা কালিদাস রাজা দুষ্যন্তের জীবনে নবচরিত্র সংযোজন করে তাঁকে "...রাজার মতোন রাজা, এমন-কী, দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন।... সেকালের লোক বিশ্বাস করিত, ব্রহ্মশাপে--কালিদাস সেকালের লোক, তিনিও বিশ্বাস করিতেন, ব্রহ্মশাপে; তাই অভিজ্ঞান-শকুন্তলে ব্রহ্মশাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মশাপ কাজে অবহেলা করার শাস্তি।" (হরপ্রসাদ, ২০০৬ : ৩৬১,৩৬৮)। এ ছাড়া চন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলের অর্থ' শীর্ষক প্রবন্ধে নায়ক রাজা দুষ্যন্তের চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন : "তিনি যে প্রকৃতপক্ষে 'কিছু বেশী রিপুপরবশ', 'রিপুর শাসনে স্খলিতপদ'— সামাজিক দর্শকবৃন্দকে সুকৌশলে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ইঙ্গিতে তা প্রকাশ করলেন এই হংসপদিকার গানের মধ্য দিয়ে।" (উদ্ধৃত, সত্যনারায়ণ, ১৯৯২ : ৯৬)

তবে রানিদের এসব আক্ষেপে রাজ-রাজাদের কিছু আসে যায় না। স্বয়ং দুষ্যন্তও হংসপদিকার গান শুনে উপলব্ধি করেন যে, উক্ত গান তাঁরই উদ্দেশে গীত হচ্ছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার। কারণ সমাজই ছিল এমন যে, পুরুষেরা ইচ্ছা করলেই একাধিক বিয়ে করতে পারতেন। অথচ নারীদের ক্ষেত্রে বহু বিয়ে তো সম্ভবই ছিল না, তদুপরি প্রতি পদক্ষেপেই তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হতো — যা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় শকুন্তলার জীবনী থেকে।

শকুন্তলা প্রত্যাখ্যাতা হওয়ার পর তার মা মেনকা তাকে নিয়ে যান মারীচের আশ্রমে। সেখানে সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। সেখানেই দুষ্যন্তের সাথে শকুন্তলার পুনর্মিলন ঘটে। আর এক্ষেত্রেও নাট্যকারের পক্ষপাতিত্ব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। মেনকার সখী

সানুমতী অদৃশ্য থেকে উপবনে দুষ্যন্তের মনস্তাপের কথা শুনতে পেয়ে শকুন্তলাকে জানান। আর শকুন্তলা, দুষ্যন্ত তাকে স্মরণ করে শোক করছেন এতটুকুতেই সন্তুষ্ট হয়। অতঃপর দুষ্যন্ত তার সামনে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার পা ধরতে গেলে শকুন্তলা বলে : "... নূনং মে সুচরিতপ্রতিবন্ধকং পুরাকৃতং তেষু দিবসেষু পরিণামমুখম্ আসীৎ। যেন সানুক্রোশো2পি আর্যপুত্রো ময়ি তথাবিধঃ সংবৃত্তঃ।" (কালিদাস, ২০১১ : ২০৪)

অর্থাৎ — আমার পূর্বজন্মের কোনো পাপের ফলেই সেই শুভ প্রতিবন্ধকের আবির্ভাব হয়েছিল যে-কারণে আমার প্রতি আর্যপুত্রের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল।

সুতরাং, এক্ষেত্রেও লক্ষ করা যাচ্ছে যে, নাট্যকার দুষ্যন্তের সম্মান বাঁচাতে শকুন্তলার পূর্বজন্মের কর্মকে টেনে আনলেন এবং অতি সহজেই দুষ্যন্তকে ক্ষমাও পাইয়ে দিলেন। অতএব, এতসব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও শকুন্তলার এত সহজেই দুষ্যন্তকে ক্ষমা করে দেয়া কি প্রমাণ করে না যে, সে-যুগে সমাজে নারীদের কোনো সম্মানজনক অবস্থানই ছিল না। আর এরই প্রতিফলন ঘটেছে কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌-এ*।

আলোচ্য নাটকের আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ নারী-চরিত্র হচ্ছে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। বলা হয় অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ব্যতীত শকুন্তলা অসম্পূর্ণ। আর এ কথা প্রকৃতপক্ষেই সত্য। কারণ দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে পুনরায় তাঁদের সাক্ষাৎ, তাঁদের গান্ধর্বমতে বিবাহ, দুর্বাসার অভিশাপ লঘুকরণ কোনোকিছুই এই দুজনকে বাদ দিয়ে সম্ভব ছিল না। কিন্তু নাটকের পরবর্তী অংশে আমরা তাদের আর কোনো উল্লেখই দেখতে পাই না। তাহলে আমরা কি বুঝব যে, নাট্যকাহিনীর গতিশীলতা আনতেই কেবল নাট্যকার এদের অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করেছেন? আর কোনো মূল্যই তাদের নেই?

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, "একা শকুন্তলা শকুন্তলার একতৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারো-আনা প্রেমালাপ তো তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১৭ : ৭৪২) শুধু তাই নয়, শকুন্তলার এই দুই সখীকে বাদ দিলে শকুন্তলা 'খণ্ডিতা শকুন্তলা' রূপে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। শকুন্তলা চরিত্রের পূর্ণতা, বিকাশসাধন এবং অপরূপে সজ্জিত করার প্রয়াসে তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা যে কত গভীর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু নাট্যকার তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন কি? রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তারা কি 'উপেক্ষিতা' নয়? প্রকৃতপক্ষেই এ নাটকে তারা উপেক্ষিতা।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই বলতে পারেন যে, তৎকালীন সমাজে নারীর কি কোনো স্বাধীনতাই ছিল না? নারী কি শুধুই পুরুষের সম্ভোগের বস্তু ছিল? নারীরা কি পুরুষশাসিত সমাজ দ্বারা নিপীড়িত, নিগৃহীত ছিল? এ প্রসঙ্গে তারা বলতে পারেন যে, এই নাটকের সূত্রধারের স্ত্রী নটী ও দুষ্যন্তের রানি হংসপদিকা প্রমুখের সঙ্গীত পরিবেশন, শকুন্তলার প্রেমপত্র লিখন ইত্যাদি বিষয়গুলো কি তৎকালীন নারীসমাজের স্বাধীনতা নির্দেশ করে না? এর উত্তরে বলা যায় যে, সূত্রধারের স্ত্রী নটী স্বামীর নির্দেশে পারিষদবর্গের মনোতুষ্টির জন্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন :

সূত্রধারঃ- আর্যে, কথয়ামি তে ভূতার্থম্।
আপরিতোষাদ্বিদূষাং ন সাধূ মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।। (প্রস্তাবনা/২)
নটী- এবম্ নু ইদম্। অনন্তকরণীয়ং তাবৎ আর্য আজ্ঞাপয়তু ।
সূত্রধারঃ- কিমন্যদস্যাঃ পরিষদঃ শ্রুতিপ্রসাদনতঃ? তদিদমেব তাবদচিরপ্রবৃত্তমুপভোগক্ষমং গ্রীষ্মসময়মধিকৃত্য গীয়তাম্ ।
নটী-তথা গায়তি (কালিদাস, ২০১১ : ১৪০)

অর্থাৎ, সূত্রধার তার স্ত্রী নটীকে বললেন, সত্যকথা বলতে কি পারিষদবর্গের তুষ্টিবিধান না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপভোগযোগ্য একটি গান কর। নটী স্বামীর নির্দেশানুসারে গান গাইলেন।

নায়িকা শকুন্তলার প্রেমপত্র লিখন প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শকুন্তলা তার নখ দিয়ে পদ্মপাতায় প্রেমাস্পদকে প্রেমপত্র লিখেছিলেন। এর দ্বারা তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো ইঙ্গিত বহন করে না। সুতরাং, উভয় ক্ষেত্রেই নারী স্বাধীনতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। উল্লেখ্য যে, রানি হংসপদিকার বিষয়টি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

যুগে যুগে কালে কালে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নারীর বহুমাত্রিক চিত্র রূপায়িত হয়েছে। নারী কখনো প্রেমে নিষ্ঠাবতী, কখনো সংযম-সহিষ্ণুতায় চির-অটল, উদ্ভাবনী শক্তিতে ব্যতিক্রম, তেজস্বিতায় অনন্য, সতীত্বে তুলনাহীনা, পতিব্রতায় অসামান্যা, আত্মত্যাগে চির-উজ্জ্বল, আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্ব ও সরলতায় অদ্বিতীয়া। নারীকে তাই বলা হয়েছে, নারী মাতৃময়ী, নারী মহীয়সী, নারী কন্যা, নারী ভগিনী। আবার এই নারীই প্রেমিকা-প্রণয়িনী। তাই বলা যায়, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না। আমাদের সামাজিক পরিবেশ, প্রতিবেশ, পরিস্থিতি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি-প্রথা নারীকে নারী করে তোলে। আর তাই এত গুণে বিভূষিতা নারী সামাজিক বন্ধনের কারণে ধর্মের গোঁড়ামি ও অন্ধ আনুগত্যে কখনো বা রাজনীতির বিচিত্র খেলায়, আবার কখনো বা আত্মস্বার্থের কারণে হয়ে ওঠে অবরোধবাসিনী, কুলত্যাগিনী, ভ্রষ্টা। তাই তাকে করা হয় সমাজচ্যুত। আদর্শের পরাকাষ্ঠায় তার জীবন দিতে হয় বলি। অথচ নারী একজন পূর্ণ অস্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। জৈবিক গঠন ব্যতীত নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা নেই বললেই চলে। কিন্তু প্রচলিত সমাজব্যবস্থা যুগে যুগে নানাভাবে ও নানা কারণে পুরুষের সাথে নারীর ভিন্নতা সৃষ্টি করে আসছে। একেবারে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণেও দেখা যাবে, আজ পর্যন্ত নারীর উপরই অবিচার করা হয়েছে অধিক। ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখা যাবে, নারীকে কখনো শূদ্রের সঙ্গে, আবার কখনো পশুর সঙ্গে সমতুল্য করে বিচার করা হয়েছে। *শতপথব্রাহ্মণে* নারীকে শুধু শূদ্রের সঙ্গে তুলনা করেই যবনিকা টানা হয়নি, অধিকন্তু নারীকে কুকুর এবং কালো প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে 'অনৃত' (কল্যাণী, ২০০০ : ১৯)। স্মৃতিকার মনুও নারীকে মিথ্যার মতোই অপবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন :

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ।
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।। ৯/১৮ (মনু, ১৪১৬ : ৭০৪)

অর্থাৎ, ধর্মানুসারে স্ত্রীলোকদের মন্ত্রপাঠ করে জাতকর্ম প্রভৃতি করার (স্মৃতি বা বেদাদি ধর্মশাস্ত্র) কোনো অধিকার নেই বলে শাস্ত্রে এরা অপদার্থ এবং এদের অস্তিত্ব মিথ্যা।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই নারীকে 'ভোগের উপচার', 'নরকের দ্বার' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে। এসবই পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর প্রতিফলিত রূপ। মহাকবি কালিদাসও পুরুষশাসিত সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসেবে নারীর সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের ভিন্ন চিত্র অঙ্কন করতে পারেন নি। তিনিও সমাজ ও সজ্জনের দ্বারা নারীকে ব্যবহার করিয়েছেন। নারীকে তিনি গড়ে তুলেছেন অকর্মক হিসেবে, সকর্মক হিসেবে নয়। শুধু তাই নয়, পুরুষের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নারী হয়েছে যূপকাষ্ঠের বলি। অথচ নারীর যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, আছে স্বাধীনতা, আছে অধিকার, আছে একটি সুন্দর মন ও স্বাধীন ইচ্ছা — এসবই তাঁর দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে । অথচ তিনি ইচ্ছা করলেই শকুন্তলের নারীদের একটি ভিন্ন চিত্র আঁকতে পারতেন। তিনি নিজে বৃত্তাবদ্ধ পুরুষশাসিত সমাজের সীমিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি বলেই আমরা নারী-চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে নাট্যকার কালিদাসের শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত লক্ষ করি।

টীকা

১. ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা কিনা সে-সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও চূড়ান্তভাবে কালিদাসের রচনা বলেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। কালিদাসের রচনা হিসেবে স্বীকৃত নাটক ও কাব্যগুলো ছাড়াও এই মহাকবির নামের সাথে আরো বেশ কতগুলো ক্ষুদ্রকাব্যগ্রন্থ যুক্ত রয়েছে। প্রকৃতই উক্ত গ্রন্থগুলোর রচয়িতা কালিদাস কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়। এই রচনাগুলোর মধ্যে *নলোদয়, রাক্ষসকাব্য, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারসার, শ্রম্নতবোধ, জ্যোতির্বিদ্যাভরণ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২. ভারতীয় সমাজে বিবাহপ্রথা ঠিক কোন সময়ে প্রচলিত হয় তার সঠিক ইতিহাস নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। তবে ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তে বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। তা থেকে মনে হয় ঋগ্‌বেদের কাল থেকেই অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকেই প্রাচীন ভারতে বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। মনুসংহিতায় সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন ভারতে আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। এই আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতি হচ্ছে : ব্রাহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্ষবিবাহ, প্রাজাপত্যবিবাহ, আসুরবিবাহ, গান্ধর্ববিবাহ, রাক্ষসবিবাহ ও পৈশাচবিবাহ। মনুসংহিতায় গান্ধর্ববিবাহ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥৩/৩২ (মনু, ১৪১৬ : ১৬৯)

অর্থাৎ, কন্যা এবং বরের মধ্যে পরস্পর অনুরাগের কারণে যে বিবাহ হয় তা সাধারণত গান্ধর্ববিবাহ নামে পরিচিত। এই বিবাহ মূলত কামকেন্দ্রিক এবং মৈথুন ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বিবাহের পরে যজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা এই বিবাহকে বৈধতা দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০০। *নারী শ্রেণী ও বর্ণ : নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান*, কলকাতা।

কালিদাস, ২০১১। গৌরীনাথ শাস্ত্রী [প্রধান উপদেষ্টা]। প্রমুখ সম্পাদিত *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ২ খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা।

মধুসূদন দত্ত, মাইকেল, ১৩৬২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস [সম্পা] (৫ম মুদ্রণ), *মধুসূদন-গ্রন্থাবলী* (কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

মনু, ১৪১৬। মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী [সম্পাদনা ও অনুবাদ] (দ্বিতীয় সংস্করণ), *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ২০০৬। সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার [সম্পা], *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, ৫* খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা।

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী [সম্পা], ১৯৯২। দ্বিতীয় সংস্করণ, *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা।

Aurobindo, Sri 1929. Kalidasa, Calcutta, India.

Dasgupta, S. N. 1947. *A History of Sanskrit Literature*, Classical Period, Vol. 1, University of Calcutta.